অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।।　একজন বঙ্গবন্ধু.. .. .. .. ।।

সম্প্রতিকালে এ বি এম মূসার 'মুজিব ভাই" বইটা পড়ছিলাম। আগেও পড়েছি তবু এই আগস্টে আবার পড়তে ইচেছ হলো। পড়লাম। নতুন করে আবার বঙ্গবন্ধুর কথা ভাবতে শুরু করলাম। কি অসাধারণ একজন মানুষ। চিন্তায় ভাবনায় চলনে বলনে নেতৃত্বে রাজনীতিতে কূটনীতিতে অনন্য এক মানুষ। দেখতে যেমন রাসভারী ওদিকে রসবোধে সর্বসেরা। সরলপ্রাণ কোমলমতি একটি মানুষ যাঁকে ভুল বোঝার অনেক সুযোগ রয়ে যায়। যাহোক এই বই থেকে কয়েকটি গল্প ভাবলাম আমার কলামের পাঠকেদের সমীপে তুলে ধরি। হয়তো কারো জানা – কারো বা অজানা। এম আর আখতার মুকুলের বই "মুজিবের রক্ত লাল " থেকেও দু'টি গল্প জুড়ে দিয়েছি। এবং সবশেষে আমার শোনা একটি গল্প দিয়ে আজকের এই লেখাটা দাঁড় করিয়েছি – শুধু বঙ্গবন্ধুকে আরো একটু কাছ থেকে দেখার জন্য। আসুন দেখি বঙ্গবন্ধুকে। গল্পগুলো বইতে যেমনভাবে তাঁদের ভাষায় লেখা আমি ঠিক সেভাবেই পত্রস্থ করেছি তাঁদেরই বচনে। কোন ভূমিকা রাখিনি সরাসরি গল্পে চলে গেছি।

নিচের চারটি গল্প এ বি এম মূসার 'মুজিব ভাই" থেকে নেয়া

লাভ ফর মাই পিপল

সদ্য স্বাধীন দেশে ফেরার মাস খানেক পরে বিবিসি'র ডেভিড ফ্রস্ট তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ঢাকা এলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি কী, হোয়াট ইজ ইওর স্ট্রেংথ?'

বঙ্গবন্ধু জবাব দিয়েছিলেন, 'মাই পিপল। আমার জনগণ।'

তার পরের প্রশ্ন 'হোয়াট ইজ ইওর উইকনেস?' আপনার সবচেয়ে বেশি দূর্বলতা কী?

উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার জনগণের জন্য ভালোবাসা। মাই লাভ ফর মাই পিপল।'

মানচিত্রের মাষ্টার

'দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আওয়ামী লীগের কর্মীবৃন্দ এসেছিল তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। কথা বলতে বলতে তিনি দেয়ালে ঝোলানো বিশ্ব-মানচিত্রের কাছে উঠে গেলেন। বললেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কি জান? এর জনসংখ্যা।

বঙ্গবন্ধু বললেন, আসো তোমাগো পড়াই।

একটা কাঠি দিয়ে মানচিত্রের ওপর বিভিন্ন দেশের দিকে নির্দেশ করতে করতে বঙ্গবন্ধু ঐসব দেশের লোকসংখ্যা মুখস্থ বলে গেলেন। আমরা সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি আবার বললেন, মাষ্টার হইলে ভাল করতাম। বুঝলা?

আশ্চর্যজনক স্মৃতিশক্তির অধিকারী বঙ্গবন্ধু। একজন মানুষের পক্ষে কতজন মানুষকে নামে ও চেহারায় চেনা সম্ভব জানি না। একেক সময় মনে হত, যাকে একবার তিনি দেখেছেন, তাকে জীবনে তিনি কখনও ভোলেন না।'

হেডেড বাই শেখ

বঙ্গবন্ধু বহুমাত্রিক চরিত্রের মানুষ ছিলেন। ছিলেন এক বিশাল হৃদয়ের ব্যাক্তিত্ব। ছিলেন এই এলাকার মানুষের স্বপ্নপূরণের এক অসামান্য ভরসার জায়গা। ছিলেন কর্মবীর। কিন্তু তাঁর রসপ্রিয়তা ছিল হৃদয়গ্রাহি। মানুষের অন্তরকে জাগিয়ে জয় করতেন হৃদয়। কঠিন কঠিন বিষয় নিয়েও রঙ্গরস করতে ছাড়তেন না। কিন্তু সবকিছুতেই অভিষ্ট ছিল বাংলাদেশ, আর বাংলাদেশের জনগণ। এই ভূ-খন্ডকে নিয়েই ছিল তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান। তাই প্রয়োজনে কঠিন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধা করতেন না। জনগণের ভালবাসায় ভর করে পথচলাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক বিবেচনা।

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সিলেটের ভূ-অভ্যন্তরে গ্যাস আগেই পাওয়া গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে কতিপয় বিদেশি কোম্পানি এসেছে গ্যাস অনুসন্ধানে। তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন প্রধানমন্ত্রী, খনিজ সম্পদমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনও। বৈঠক শেষে গণভবনের পূর্ব বারান্দায় যথারীতি বসেছে আড্ডা তথা খোশগল্পের আসর। সেখানে একটু আগে সম্পন্ন হওয়া বিদেশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আলাপের প্রসঙ্গটি এল। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কয়েকটি বিদেশি অনুসন্ধান কোম্পানিকে আমি বলেছি, শুধু গ্যাস নয়, আমাদের তেলও আছে। তারা জানতে চাইল, এ নিয়ে অতীতে কোনো অনুসন্ধান হয়েছে কি না। আমি বলেছি, তা হয়নি। তবে আমি নিশ্চিত, আমাদের তেল আছে। আরব দেশগুলোর তেল পাওয়ার যে দুই ক্রাইটেরিয়া তথা যথার্থতা রয়েছে, তা আমাদেরও আছে।'

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন 'কিছু বুজলা'? আমরা দুদিকে ঘাড় নাড়লাম। বঙ্গবন্ধু কৌতুকভরা চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তাগোরে কইছি, তেল পেতে হলে দেশটির দুটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যা আমাদের আছে। এক. মুসলিম দেশ হতে হবে। দুই. ইট মাষ্ট বি হেডেড বাই শেখ। রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানকে শেখ হতে হবে।

কথাগুলো বলে দিলখোলা বঙ্গবন্ধু হো-হো-করে হসে উঠলেন।

ফেরেশতাকো তোমলোক খুন কিয়া

বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার দুই দিন পর। বঙ্গবন্ধু একদিন পুরোনো গণভবনে আমাকে বললেন, হ্যাঁ রে সবাইকে দেখলাম বদরুদ্দিন ভাই কোথায়? বদরুদ্দিন মানে তৎকালীন পাকিস্তানি মালিকানার ট্রাস্টের পত্রিকা মর্নিং নিউজ-এর সম্পাদক। পত্রিকাটি অহর্নিশ তাঁর কুৎসা গেয়েছে, আগরতলা মামলার সময় তাঁর ফাঁসি দাবি করেছে। এই সেই পত্রিকা যার অফিস বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় জনগণ পুড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর সম্পর্কে অহর্নিশ বিষোদগারকারী সেই পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গেও তাঁর ব্যাক্তিগত সম্পর্কেও কমতি ছিল না। তাঁর নিরাপত্তা বিষয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে বললেন, ‘কোথায় আছেন বদরুদ্দিন ভাই? খুঁজে নিয়ে আয়। ভালো আছেন তো? কোন অসুবিধায় নেই তো?’

বঙ্গবন্ধুর আদেশে বদরুদ্দিনকে খুঁজতে লাগলাম। পেয়েও গেলাম, লালমাটিয়ার একটি বাড়িতে আত্মগোপন করে আছেন তিনি। বহু কোশেশ করে দেখা করলাম। বললাম, ‘মুজিব ভাই আপনাকে খুঁজছেন। চলুন আমার সঙ্গে।’ বদরুদ্দিন ভাইয়ের চোখমুখ যেন ঝলসে উঠল, ‘ক্যায়া, শেখ সাব মুঝে বোলায়া, ক্যান আই গো টু হিম, সি হিম? নিয়ে এলাম তাঁকে গণভবনে, যেন দুই বৈরী নয়, যেন দুই বন্ধুর মিলন দেখলাম। বুকে জড়িয়ে ধরলেন, পাশে বসালেন। নেতা জিজ্ঞেস করলেন, ‘হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ। আপনি কী করতে চান? কাঁহা যাতে চাহেঁ? কোন বিপদে নেই তো? আবেগময় প্রশ্নগুলো শুনে বদরুদ্দিন আধো কান্না আধো খুশি মেশানো কন্ঠে বললেন, ‘পাকিস্তানে যেতে চাই, মে আই লিভ ফর করাচি? বঙ্গবন্ধু একান্ত সচিব রফিকউল্লাহকে ডাকলেন, ‘বদরুদ্দিন ভাই যা চান, তা-ই করে দাও।’ উল্লেখ করা প্রয়োজন পাকিস্তান তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। ভারতের সঙ্গেও নৌ-স্থল-বিমান যোগাযোগ নেই। কিছু অবাঙালি গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত ও কাঠমুন্ডু হয়ে তারপর পাকিস্তানে যাচ্ছেন।

তার পরের কাহিনী। বদরুদ্দিন ভাইয়ের আরেকটি প্রার্থনা, আসাদ অ্যাভিনিউয়ের বাড়িটি বিক্রি করবেন, সেই টাকাও তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বাহাত্তরে সেই সময়ে একজন বিহারির এহেন একটি আবদার কেউ কল্পনাও করতে পারত না। কিন্ত বঙ্গবন্ধু বলেন তথাস্তু, তা-ই হবে।

ক্রেতা ঠিক হলো আতাউদ্দিন খান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, পরবর্তী সময় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধুর সচিব রফিকউল্লাহ চৌধুরীর সহায়তায় সচিব আতা সাহেব বাড়ি কিনে যে টাকা দিয়েছিলেন তা বিদেশি মুদ্রায় রূপান্তরিত করে বাইরে নেওয়ার অনুমতি দিয়ে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর (বর্তমানে প্রয়াত) হামিদুল্লাহ সাহেবকে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন। অত:পর বদরুদ্দিন স্বচ্ছন্দে নেপাল হয়ে পাকিস্তানে চলে গেলেন।

পঁচাত্তরের অনেক বছর পর লাহোরে বদরুদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন। বলছিলেন, 'আল্লাহর শোকর, শেখ সাহেব ফিরে এসেছিলেন। তাই তো বেঁচে আছি। এখনো বহাল তবিয়তে আছি '

তারপরই মাথা থাবড়াতে থাকলেন, 'ইয়ে ফেরেশতা কো তোমলোক নে খুন কিয়া?'

এরপরের গল্প দুটি এম আর আখতার মুকুলের "মুজিবের রক্ত লাল" বই থেকে নেয়া

ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার ১৭ মার্চ

স্বাধীন-সার্বভৌম করার অব্যবহিত পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরো একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন, তার উল্লেখ না করলে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শুধু আলোচনার মাধ্যমে এ দেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করার একক কৃতিত্বও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আন্তরিক সহযোগিতা ছিল তুলনাহীন।

আমার স্থির বিশ্বাস, বাংলাদেশের অন্য কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পক্ষে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন অসম্ভব ছিল। স্বাধীনতার ঠিক ৯০ দিনের মাথায় কিভাবে বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যবস্থা হয়েছিল, আমি নিজেই তার অন্যতম সাক্ষী। এখন সেই দুর্লভ মুহূর্তের প্রতিবেদন।

দুপুরে খাওয়ার পর কলকাতার রাজভবনে আমরা জনাকয়েক শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে একান্তে আলাপ করছিলাম। আমি তখন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য দপ্তরের মহাপরিচালক। দিন দুই আগে ঢাকা থেকে ৩৫ জন সাংবাদিককে নিয়ে কলকাতায় এসেছি। এসব সাংবাদিক কলকাতায় এসেছেন বঙ্গবন্ধুর প্রথম বিদেশ সফরসংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য। তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কলকাতার বিখ্যাত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। আমার মনে তখন দারুণ কৌতূহল। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে বুকে সাহস সঞ্চয় করে বললাম, 'স্যার, বাংলাদেশ ও ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে আলোচনা হতে যাচ্ছে, তাতে এজেন্ডা তো দেখলাম না? তাহলে আপনারা কী কী বিষয়ে আলোচনা করবেন?'

শেখ সাহেব তাঁর পাইপটাতে ঠিকমতো আগুন ধরিয়ে এরিনমোর তামাকের গন্ধওয়ালা একগাদা ধোঁয়া ছেড়ে কথা বলতে শুরু করলেন : 'পাকিস্তানের কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে লন্ডনে গেলাম। সেখান থেকে ঢাকায় আসার পথে দিল্লি বিমানবন্দরে জীবনে প্রথম এই

মহিলাকে (ইন্দিরা গান্ধীকে) দেখলাম। এর আগে তো এঁর সঙ্গে আমার কোনো পরিচয়ই ছিল না।'

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'স্যার, মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দারুণভাবে সাহায্য করা ছাড়াও আপনার জীবন বাঁচানোর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দরজায় ঘুরেছেন।'

বঙ্গবন্ধু মুচকি হেসে আবার কথা শুরু করলেন, 'তোদের বন্ধুবান্ধবরা তো আমাকে অর্ধশিক্ষিত বলে। তাহলে ইতিহাস থেকে একটা কথার জবাব দে? আজ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ কিংবা কমিউনিস্ট কিংবা অন্য কেউ, যারাই অন্য দেশে সৈন্য পাঠিয়েছে, তারা কি স্বেচ্ছায় সৈন্য প্রত্যাহার করেছে? তোরা কি দেখাতে পারিস যে এমন কোনো দেশ আছে?'

আমরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

উনি পাইপে পর পর কয়েকটা টান দিয়ে হালকা মেজাজে কথা আরম্ভ করলেন, 'কানের মাঝ থেকে সাদা-কাঁচা চুল বাইরাইয়া আছে, ভারতে এমন সব ঝানু পুরনো আইসিএস অফিসার দেখছোস? এঁরা সব ইন্দিরা গান্ধীরে বুদ্ধি দেওনের আগেই আজ আলোচনার সময় ম্যাডামের হাত ধইরা কথা লমু। জানোস কী কথা? কথাটা হইতাছে, ম্যাডাম তুমি বাংলাদেশ থাইক্যা কবে ইন্ডিয়ান সোলজার ফেরত আনবা?'

বঙ্গবন্ধু প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। কলকাতার রাজভবনে ফার্স্ট রাউন্ড আলোচনার শুরুতে দুজনে পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। এরপর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্য ভারতের জনগণ, ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বঙ্গবন্ধু হঠাৎ করে আসল কথাটা উত্থাপন করলেন।

মুজিব : ম্যাডাম, আপনে কবে নাগাদ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করবেন?

ইন্দিরা : বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি তো এখন পর্যন্ত নাজুক পর্যায়ে রয়েছে। পুরো 'সিচুয়েশন' বাংলাদেশ সরকারের কন্ট্রোলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা কি বাঞ্ছনীয় নয়? অবশ্য আপনি যেভাবে বলবেন, সেটাই করা হবে।

মুজিব : মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রায় ৩০ লাখ লোক আত্মাহুতি দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে আইন ও শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির জন্য আরো যদি লাখ দশেক লোকের মৃত্যু হয়, আমি সেই অবস্থাটা বরদাশত করতে রাজি আছি। কিন্তু আপনারা অকৃত্রিম বন্ধু বলেই বলছি, বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ইন্দিরা : এক্সিলেন্সি, কারণটা আরেকটু ব্যাখ্যা করলে খুশি হব।

মুজিব : এখন হচ্ছে বাংলাদেশ পুনর্গঠনের সময়। এই মুহূর্তে দেশে শক্তিশালী রাজনৈতিক বিরোধিতা আমাদের কাম্য নয়। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতিকে অছিলা করে আমাদের বিরোধীপক্ষ দ্রুত সংগঠিত হতে সক্ষম হবে বলে মনে হয়। ম্যাডাম, আপনেও বোধ হয় এই অবস্থা চাইতে পারেন না। তাহলে কবে নাগাদ ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করছেন?

ইন্দিরা : (ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে একটু চিন্তা করলেন) এক্সিলেন্সি, আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আগামী ১৭ই মার্চ বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে।

মুজিব : ম্যাডাম, কেন এই বিশেষ দিন ১৭ই মার্চের কথা বললেন?

ইন্দিরা : এক্সিলেন্সি প্রাইম মিনিস্টার, ১৭ই মার্চ আপনার জন্ম তারিখেই আমাদের সৈন্যরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে আসবে।

ইন্দিরা গান্ধী তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। ভারত সরকারের আমলাতন্ত্র এবং দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক মহলের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে যেদিন ভারতীয় সৈন্যদের শেষ দলটি বাংলার মাটি ত্যাগ করে সেদিন ছিল ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন।

বাদশাহ ফয়সলকে বললেন লাকুম দ্বীনও কুম ওয়ালিয়াদ্বীন

সৌদি আরব যেদিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, সেদিন বঙ্গবন্ধুর জানাযা পড়া হচ্ছে এদেশে। ১৬ই আগষ্ট ১৯৭৫। ৭১ এ আমরা স্বাধীন হলেও ওদের অপেক্ষা করতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু পর্যন্ত।

থাক সেসব কথা। যেটা বলতে চাচ্ছিলাম তা হলো, ৭১-৭৫ এই দীর্ঘ সময়টুকু সৌদির জন্য বাংলাদেশ নামক কোনো দেশের অস্তিত্ব না থাকায় বাংলাদেশীরা হজ্ব করতে যেতে পারছিলেন না।

বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ১৯৭৩ এর দিকে ইন্দিরা গান্ধি একটি অর্ডিনেন্স পাশ করেন, যেখানে বলা হয় বাংলাদেশীরা ভারত থেকে হজ্ব যাত্রা করতে পারবে।
কিছু মানুষ এভাবে হজ্ব পালন করেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু দ্বৈত নাগরিকতা প্রদর্শন ছাড়াও অন্যান্য জটিলতায় এই ব্যবস্থা বেশীদিন টেকেনি।
বঙ্গবন্ধু সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অনেক কুটনৈতিক আলোচনা করেও সৌদি সরকারের নাগাল পাওয়া যাচ্ছিলো না।

এমতাবস্থায় ১৯৭৩ এর ৫ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে চতুর্থ ন্যাম সম্মেলনে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু। বৈঠক চলাকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সৌদির বাদশাহ ফয়সালের সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলামের প্রচেষ্টায় অবশেষে একটা বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছিলো।
পরিচয়ের শুরুতেই বাদশাহ ফয়সল এবং প্রধানমন্ত্রী মুজিবের মধ্য আনুষ্ঠানিক কোলাকুলি এবং চুম্বন শেষ হলো। এরপর দুই নেতা পাশাপাশি সোফায় বসলেন। বাদশা ফয়সালের দোভাষী বসলেন মাঝখানে। উল্টো দিকের সোফায় উভয়দেশের অন্যান্য প্রতিনিধিরা। পারস্পরিক স্বাস্থ্য ও কুশল বিনিময়ের পর কথপোকথন শুরু হলো। কথোপকথনের মূল অংশ গুলি এমনঃ

বাদশাহঃ এক্সেলেন্সী আমি শুনেছি যে, বাংলাদেশ আমাদের কাছে কিছু সাহায্যের প্রত্যাশী। আপনি আসলে কি ধরনের সাহায্য চাচ্ছেন। আর হ্যাঁ, যে কোন ধরনের সাহায্য দেওয়ার আগে আমাদের কিছু পূর্বশর্ত আছে।

মুজিবঃ এক্সেলেন্সী – বেয়াদবী নেবেন না। আমি হচ্ছি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী । বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আমার মনে হয় না মিসকিনের মত বাংলাদেশ ভিক্ষার জন্য আপনার কাছে কোন সাহায্য চেয়েছে।

বাদশাহঃ তাহলে আপনি কিংডম অব সৌদি এরাবিয়ার কাছে কি আশা করছেন?

মুজিবঃ বাংলাদেশের পরহেজগার মুসলমানরা পবিত্র কাবায় গিয়ে ইবাদত পালনের অধিকার দাবী করছে। ইবাদত পালনের জন্য তো কোন পূর্বশর্ত থাকতে পারে না। আপনি পবিত্র কাবা শরীফের তত্ত্বধায়ক। বাঙালী মুসলানদের কাছে আপনার স্থান অনেক উচুতে। একথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদেরই সেখানে ইবাদত করার অধিকার রয়েছে। সেখানে ইবাদত পালন করার কোন প্রকার শর্ত আরোপ করা কি ন্যায়সঙ্গত? আমরা সমঅধিকারের ভিত্তিতে আপনার সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ন সম্পর্ক চাই।

বাদশাহঃ কিন্তু এটা তো কোন রাজনৈতিক আলোচনা হলো না। এক্সেলেন্সী দয়া করে আমাকে বলুন আপনি সৌদি আরবের কাছে আসলেই কি আশা করছেন?

মুজিবঃ ইউর এক্সেলেন্সী। আপনি জানেন যে, ইন্দোনেশিয়ার পর বাংলাদেশ দ্বিতীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। আমি জানতে চাই, কেন সৌদী আরব স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি?

বাদশাহঃ আমি অসীম ক্ষমতাবান আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে জবাবদিহি করি না। তবু আপনাকে বলছি, সৌদি আরবের স্বীকৃতি পেতে হলে বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে “Islamic Republic of Bangladesh” করতে হবে।

মুজিবঃ এই শর্ত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। বাংলাদেশের জনগনের অধিকাংশ মুসলিম হলেও, আমার প্রায় এক কোটির মত অমুসলিমও রয়েছে। সবাই একসাথে একাত্তরে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে, দূর্ভোগ সহ্য করেছে।
আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্যই নন। তিনি বিশ্বভ্রমান্ডের স্রষ্টা রাব্বুল আল - আমিন। ইউর এক্সেলেন্সী, ক্ষমা করবেন, আপনার দেশের নামটাও তো “Islamic Republic of Saudi Arabia” নয়। বাদশা ইবনে সৌদের নামে নাম রাখা হয়েছে “Kingdom of Saudi Arabia”। আমরা কেউই তো এই নামে আপত্তি করিনি।

বাদশাহঃ এক্সেলেন্সী – এছাড়া আমার অন্য একটি শর্ত রয়েছে এবং তা হচ্ছে অবিলম্বে সমস্ত পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীকে ছেড়ে দিতে হবে।

মুজিবঃ এক্সেলেন্সী, এটাতো বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষীয় ব্যাপার। দু’দেশের মধ্যে এমন আরো অমীমাংসিত বিষয়াদি রয়ে গেছে, যেমন ধরুন বাংলাদেশের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ, আটকেপড়া অবাঙালিদের পাকিস্তানে ফেরত যাওয়া। তাই শুধুমাত্র বিনাশর্তে ৯১ হাজার যুদ্ধবন্দী ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি আলাদা করে বিবেচনা করা সমীচিন হবে না। তাছাড়া সৌদী আরব এ ব্যাপারে এতো উদগ্রীব কেন?

বাদশাহঃ এক্সেলেন্সী, শুধু এটুকু জেনে রাখুন সৌদী আরব আর পাকিস্তান একই কথা। পাকিস্তান আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তা’হলে এক্সেলেন্সী – আর তো কথা থাকতে পারে না। তবে আমাদের দুটো শর্তের কথা চিন্তা করে দেখবেন।

মুজিবঃ প্রায় দুবছর পর্যন্ত সৌদী আরব স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ায় সেখানকার পরহেজগার মুসলমানেরা যে পবিত্র হজ্জ আদায় করতে পারছে না সে কথা ভেবে দেখেছেন কি এক্সেলেন্সী? এভাবে বাধার সৃষ্টি করা জায়েজ হচ্ছে কি? পবিত্র কাবা শরীফে দুনিয়ার সব মানুষের নামাজ পড়ার হক রয়েছে।

এ সময় অনাকাঙ্খিতভাবে আলোচনা শেষ হয়ে যায়। উঠে পড়েন বাদশা ফয়সাল। দু নেতা বেরিয়ে যেতে থাকেন। যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করেন “লা-কুম দ্বীন-কুম ওয়াল-ইয়া দ্বীন”। তোমার ধর্ম তোমার – আমার ধর্ম আমার

এবারের গল্পগুলো এ বি এম মূসার “মুজিব ভাই” থেকে -

যা লেখাবার সন্ধ্যার আগে লেখাবি

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরের ঘটনা। বঙ্গবন্ধু আমাকে প্রথমে টেলিভিশনের মহাপরিচালক, পরে ‘দৈনিক মর্নিং নিউজ’ -এর সম্পাদক করলেন। ইংরেজি দৈনিকটা ছিল পরিত্যক্ত সম্পত্তি, সাংবাদিক-কর্মচারী অবাঙালি যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকে আগেই পাকিস্তানে চলে গেছেন। ইংরেজি লেখার সাংবাদিক নেই। এরই মধ্যে একদিন আমার বন্ধু জ্যাক - জাকারিয়া খান চৌধুরি, পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা – দীর্ঘদিন বিলেতে থাকার পর স্বাধীন বাংলাদেশে চলে এল , সঙ্গে স্ত্রী স্থপতি শামীম শিকদার। সে একদিন আমার দপ্তরে এসে বলল, ‘ দোস্ত, ফিরে এসেছি, এখন চাকরি দে।’

জ্যাক খুব ভালো ইংরেজি জানত। তাকে ‘মর্নিং নিউজ’-এর সহকারী সম্পাদকের পদে নিয়োগ দিলাম।

এরপর একদিন বিকেলে তাকে বললাম ,‘ দোস্ত, চলো গণভবনে, প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করব।’ বস্তুত তখন প্রতিদিন পুরনো গণভবনে, বর্তমান ‘সুগন্ধা’র পেছনের বারান্দায় সন্ধ্যায় মুজিব ভাই আমাদের অনেকের সঙ্গে গালগপ্প করতেন। জ্যাক পায়ে সালাম করে উঠে দাঁড়াতেই মুজিব ভাই বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন , ‘ এটাকে আবার কে নিয়ে এল?’

উল্লেখ্য, জ্যাকের সিলেটের বনেদি পরিবারের সবাইকে বঙ্গবন্ধু ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। আমি বললাম ,জ্যাক ফিরে এসেছে , ওকে আমার কাগজে নিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বললেন, ‘তা ওর কাজ কী?’ বললাম, সম্পাদকীয় আর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উপসম্পাদকীয় লিখবে। শুনে তিনি মুচকি হাসি দিয়ে বললেন , ‘ বেশ ভালো।’

তারপর স্বভাবজনিত মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, ‘ যা লেখাবার সন্ধ্যার আগে লেখাবি। খবরদার, সন্ধ্যার পরে যেন কিছু না লেখে।’

ইঙ্গিতটা বুঝে জ্যাক লজ্জায় লাল। আর আমরা তো হো-হো করে হেসে উঠলাম। প্রধানমন্ত্রীর পরিহাসটি ছিল জ্যাকের প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বিশেষ পানীয় পানের কারণে বেহাল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত।

এক শাড়ি দুই বউ

ঘটনাটি বাহাত্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফরের সময়ের। বঙ্গভবনে অনুষ্ঠান শেষে তিনি ১৪ জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী প্রত্যেকের হাতে উপহারস্বরুপ একটি করে ভারতীয় বেঙ্গালুরু সিল্কের শাড়ি দিলেন। বলা বাহুল্য, শাড়িগুলো মন্ত্রীদের বেগম সাহেবদের জন্য। শাড়ি বিতরণ শেষ, মন্ত্রীরা ইন্দিরা গান্ধীকে সমবেতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। এমন সময় দূর থেকে এগিয়ে এলেন বঙ্গবন্ধু। তৎকালীন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরের শাড়ি প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে জহুর

আহমদ চৌধুরীর হাতে ধরিয়ে দিলেন। ইন্দিরাজি অবাক হয়ে বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, মনোরঞ্জন ধর ব্যাচেলর মানুষ। তাঁর শাড়ির দরকার নেই। বেচারা জহুরের দুই বউ। এক শাড়ি নিয়ে দুইজনে টানাটানি করবে। তাই তাঁরটি জহুরের আরেকটি বউয়ের জন্য দিলাম।

মালা দিলেন , মালা পেলেন বাদশা মিয়া

‘চট্টগ্রাম থেকে বাদশা মিয়া সওদাগর নামে একজন ব্যবসায়ী বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানাতে একটা বড়সড় ফুলের মালা নিয়ে গণভবনে এলেন। নাদুস নুদুস মোটা চেহারার ভদ্রলোক। আমি চট্টগ্রামে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছিল। সেই সূত্রে তিনি আমার অফিসকক্ষে এসে বসলেন।

চাঁটগায়ের আঞ্চলিক ভাষায় তিনি তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে আমি জানালাম, সাক্ষাৎকারের বিষয়টি একান্ত সচিবের এখতিয়ার। আপনি ফরাসউদ্দীন সাহেবের কাছে যান।

তিনি জানালেন একান্ত সচিব ফরাসউদ্দীনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু একান্ত সচিব তাঁকে অপারগতা জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দনসূচক ফুলের মালা দেয়া গতকাল থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এমতবস্থায় আর কিছু করা যাবে না।

আমি ফরাসউদ্দীনকে ইন্টারকমে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে একই উত্তর পেলাম।

বাদশা মিয়া সওদাগর মন খারাপ করে বললেন, আমার কয়েক হাজার টাকা ক্ষতি হয়ে গেল।

মানে?

আজ কদি’ন থেকে আমি পূর্বাণী হোটেলে আছি। একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম, বঙ্গবন্ধুকে মালা পরাবো।

আপনি গতকাল এলেই তো পারতেন। আমি বললাম।

গতকালই আসতাম। কিন্তু একটা ভাল ফুলের মালা যোগাড় করতে পারিনি। আজ এটা অর্ডার দিয়ে বানিয়ে এনেছি।

ভদ্রলোকের দুঃখও আমাকে ভারাক্রান্ত করল। আমি তাঁকে চা ও মিষ্টি সহযোগে সমবেদনা জানালাম।

ইতোমধ্যে ইন্টারকম বাজল। অপরপ্রান্ত থেকে ফরাসউদ্দীন বললেন, আপনার মেহমান কি চলে গেছেন?

না। আমার সামনেই আছেন।

ওঁকে বঙ্গবন্ধুর অফিসের সামনে যেতে বলুন। কুমিল্লা থেকে আওয়ামী লীগের কর্মীদের একটা দল এসেছে। এত দূর থেকে আসায় বঙ্গবন্ধু তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে সম্মত হয়েছেন। বাদশা মিয়া তাঁদের সঙ্গে ভেতরে যেতে পারেন।

আমি বাদশা মিয়া সওদাগরকে বিষয়টা বলতেই তিনি ফুলের মালাটা নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট পনের পরে বাদশা মিয়া আবার আমার ঘরে এসে উপস্থিত।

ফুলের মালাটি তাঁর গলায় শোভিত। বললেন , আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম।

কি ব্যাপার! কিছুটা বিব্রত হয়ে বললাম, আপনি কি মালা দিতে পারেননি?

মালা দিয়েছি। খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে বাদশা মিয়া জানালেন, বঙ্গবন্ধুকে মালাটি পরিয়ে দিতেই তিনি মালাটি গলা থেকে খুলে আবার আমার গলায় পরিয়েও দিলেন। এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

বাদশা মিয়ার চোখে মুখে আনন্দ। তাঁর আনন্দে আমিও আনন্দিত। বললাম , যাক। আপনার এত টাকা খরচ করে ঢাকায় আসা ও থাকা সার্থক হল।

টাকার জন্য ভাবি না। তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধু আমার নাম জেনেছেন, আমাকে চিনেছেন, ব্যাস! এতেই আমার কাজ হয়েছে। এখন থেকে সারাজীবন তিনি আমাকে মনে রাখবেন। তিনি একবার কাউকে দেখলে কখনও তাকে ভোলেন না। আমিও যদি ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তিনি চিনতে পারবেন। টাকা দিয়ে এটুকু পাওয়া যায় না।

কথা শুনে সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি বলব, ভেবে পেলাম না।

বাদশা মিয়া বললেন , মালাটা আপনাকে দিয়ে যাই?

না,না। আমাকে কেন? আপনি বরং মালাটা নিয়ে যান। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের দেখাতে পারবেন।

তাই ভাল। বাদশা মিয়া সওদাগর মালা গলায় ঘর থেকে বেরিয়ে যান।'

জহুরের কাঁধে জন্মনিয়ন্ত্রণ

নিজের মন্ত্রীদের নিয়ে মাঝে মধ্যেই রসিকতা করতেন বঙ্গবন্ধু। দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। এরপর বিকেলবেলা সংবাদ সম্মেলন করার পর যথারীতি আমাদের সঙ্গে সান্ধ্য আড্ডায় বসলেন। তখনো মন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন হয়নি। এ নিয়ে আমরা একটুখানি কৌতূহল প্রকাশ করায় তিনি কৃত্রিম গম্ভীরতার সঙ্গে জানালেন, 'সব এখন বলব না, একটু পরেই জানতে পারবা। উপযুক্ত ব্যাক্তিকেই যথাযথ দায়িত্ব দিয়েছি। তবে একটা দপ্তর নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম। অনেক ভেবেচিন্তে সেটা জহুরের কাঁধে চাপালাম। দপ্তরটি হচ্ছে স্বাস্থ্য ও জন্মনিয়ন্ত্রণ (পরবর্তীকালে পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)। ভেবে দেখলাম, আমার মতো সারা জীবন জেল খাইটা তার শরীরডা খ্যাংরা কাঠির মতো হইয়া গেছে। সব ডাক্তারকে সে মাইনষের স্বাস্থ্য ভালো করার তাগিদ দিতে পারব। সে আবার দুই

বউয়ের ১৪ টি বাচ্চা নিয়ে হিমশিম খাইতাছে। বেশি বাচ্চা হওয়ার জ্বালা সে-ই ভালো বোঝে। তাই তারে জন্মনিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিয়েছি।'

এই 'জহুর' হচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহচর জহুর আহমদ চৌধুরি। জহুর আহমদ চৌধুরিকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিচ্ছেন যোগ্যতম মানুষ ভেবেই। কিন্তু তাঁকে নিয়ে রঙ্গরস করতেও ছাড়েন নাই। এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা খুঁজে পাই অতুলনীয় আরেক বঙ্গবন্ধুকে। ব্যাক্তি , প্রশাসক, রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক নেতা-সর্বক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু এই জাতির আশা-আকাংখার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন এভাবেই।

আমার শোনা সেই গল্পটিঃ

পিয়ন ফরিদের ঘুম

২০০৪ সনের একুশে আগষ্ট, সিডনির পুলিশ সিটিজেন ক্লাবে বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রিলিয়া আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধুর দেহরক্ষী প্রাক্তন এমপি জনাব মহিউদ্দীন। বক্তৃতায় জনাব মহিউদ্দীন বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর নানান স্মৃতিকথা বলছিলেন। সেখান থেকেই এ গল্প।

বঙ্গবন্ধু তখন রাষ্ট্রপতি। দুপুরে খাবারের পর গণভবনে তিনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করতেন। পাইপ আর দুপুরের তন্দ্রাটাই তাঁর বিলাসিতা। বঙ্গবন্ধু যখন বিছানায় কাত হতেন মহিউদ্দিন বঙ্গবন্ধুর গা হাত পা টিপে দিতেন। বঙ্গবন্ধু এটা যেমন চাইতেন মহিউদ্দীনও তেমনি আনন্দ পেতেন। একদিন দুপুরে মহিউদ্দীনের বাসায় হঠাৎ মেহমান। তাঁকে যেতেই হবে। তাই তিনি বঙ্গবন্ধুকে বলে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর বাসায় গেছেন। যাবার আগে বঙ্গবন্ধুর পিয়ন ফরিদকে বলে গেছেন সে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন বঙ্গবন্ধুর গা হাত পা টিপে দেয়। মহিউদ্দিন তাঁর অতিথি বিদায় করে গণভবনে ফিরে এসে যে দৃশ্যটি দেখেন তাহলো - বঙ্গবন্ধু ঘন্টা খানেক আগে যেমনি কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন ঠিক তেমনই আছেন। আর তাঁর পায়ের উপর পিয়ন ফরিদ মাথা রেখে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর পা ফরিদের মুখের লালায় ভরে আছে। মহিউদ্দীনের ঘরে প্রবেশ বুঝতে পেরে বঙ্গবন্ধু ফিসফিসিয়ে মহিউদ্দীনকে বলছেন - শব্দ কোর না। ফরিদ ঘুমাচ্ছে। ও খুব ক্লান্ত। ওকে ঘুমোতে দাও। বঙ্গবন্ধুকে মহিউদ্দীন যে অবস্থায়, যে কাত হওয়া অবস্থায় দেখে গেছেন তিনি সে অবস্থাতেই চোখ বুঁজে আছেন। একটুও নড়েননি। পাছে ফরিদের ঘুমটা ভেঙ্গে যায়।

এই বঙ্গবন্ধুকেই খুনীরা মেরে ফেলেছে। তাঁর নিরাপরাধ প্রায় গোটা পরিবারকে হত্যা করেছে স্বজ্ঞানে। খুনীদের বিচার হয়েছে কারো কারো ফাঁসিও হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কি আর ফিরে আসবেন? করুণাময় তাঁকে এবং তাঁর নিহত পরিবারের সদস্যদের ক্ষমা করে জান্নাতে স্থান দিন।